# আক্রোশ এবং অবশিষ্ট

অংশু মোস্তাফিজ

এখানে একটা পাকুড়ের গাছ ছিল। শতবর্ষী। শতবর্ষী বলা সংগত হবেনা। আমার পিতামহ, যাকে আমারা দাদা বলে ডাকতাম, তিনিও বলেছিলেন, তার জন্মের পর গাছটিকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখেছিলেন। দাদা মারা গেছেন ষাট বছর হয়। যখন জেলে যাই তখনো গাছটি দেখেছি। এখন নাই কেন? কেউ কি কেটে ফেলেছে? অন্তত এই শতকেও এ পাকুড়ের মারা যাবার কথা নয়। আমি কি রাস্তা ভুল করছি? না। তা কেন, এইতো শ্যামলীর মোড়। জোড়া দীঘি। তাহলে? যাহোক, সে কারো থেকে জেনে নেয়া যাবে।

ঘুম থেকে জেগে দেখি সন্ধ্যা আসন্ন। বাড়ি ভর্তি লোক। এই লোকগুলোর অনেককেই আমি চিনিনা। সম্ভবত আমাকেও সকলে নয়। যখন ঘর থেকে বেরোলাম, উঠানটা এক মূহুর্ত্তে চুপ করে গেল। এক গ্রাম মানুষ উঠানে, কেউ কোন কথা বলছে না। বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করলো না। ঘরে ফিরতে চাচ্ছিলাম। টুলু চাচার মুখ দেখতে পেলাম। মুমূর্ষু অবস্থা। কাছে গিয়ে বললাম, কেমন আছেন চাচা? চাচা বললেন, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে না? তুমি এতো করলে, আমরা তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। টুলু চাচা কেঁদে ফেললেন। বললেন, সবাই মারা গেছে বাবা। তোমার বাবাকেও আটকাতে পারিনি। আয়ুব, লতিফ শহরে থাকে। আর কেউ নেই। যাদের দেখছো, তোমাকে এরা চেনেনা। তোমার সব ঘটনা জানে। তোমাকে দেবতা মানে। এদের কিছু বলো। মহিলারা আঁচলে চোখ মুছছেন। শব্দ করে কেঁদে ফেললো একজন। আমি কি বলতাম, কিছু বুঝে উঠিনি। বললাম, শ্যামলীর মোড়ের পাকুর গাছটি কোথায় চাচা? চাচা বললেন, সে দশ বছর আগে কেটেছে সরকারের লোক। পাকা সড়ক বানিয়েছে। আরো কত কি, তুমি এসব জানো না। চাচাকে বলতে ইচ্ছে হলো, আমি এসব জানি। জেলে বসে খবরের কাগজে সব পড়েছি। কিন্তু মেলাতে পারছি না। দেশের কি এমন পরিবর্তন হয়েছে বুঝতে পারছি না। শ্যামলীর মোড়ের পাকুড় গাছ কেটে পাকা সড়ক বানালেই পরিবর্তন হয়ে গেল। সড়কইবা পাকা কোথায়, পীচের ছাল বাকল উঠে এখানে ওখানে গর্ত দেখলাম। টুলু চাচা কি একটা বলতে চাচ্ছিলেন, মা থামিয়ে দিলেন। মা বললেন, তোমরা এখন যাও। বাদলকে খেতে দেব। এক মহিলা, মায়ের বয়সী আমি ঠিক চিনতে পারলাম না, বললেন, এতোদিন পর ছেলে দেশে ফিরলো, কি দিয়ে খেতে দেবে? মা কোন কথা বললেন না।

কাল রাতে ভালো ঘুম হয়েছে। অনেকদির পর। অনেকবছর পরও বলা যায়। আগের বাড়িটাই আছে। বাড়ি বলতে এখনো একটা ঘর। বাশের বেড়া। পলিথিনের ছাউনি। এখানে ওখানে

ছেড়া। খুব সকালে চোখে আলো লাগলে ঘুম ভাংলো আমার। এদিক ওদিক হেঁটে বেড়ালাম। এই আমার গ্রাম। সবই চেনা। অচেনা মুখ। দু'চারটা ইট সিমেন্টের বাড়ি ছাড়া গ্রামের অবস্থা বলতে যা দেখে গেছি, এখনো তাই। চৌধুরী বাড়ির সামনে এসে হাসি পেয়েছিল আমার। ঝলসানো চৌধুরী বাড়ি। ঝোপঝাড়, গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে কলজে রং ইটের দেয়ালগুলো। এইসব ইট আমার চেনা। বাড়ি ছেড়ে চৌধুরীরা কবে চলে গেছে জানা হয়নি। বাড়ি ফিরে যেতে যেতে কাল রাতের কথা মনে পড়লো। তক্তপোসে আমার বিছানা পেতে দেয়া হয়েছিল। মা শুলেন মেঝেতে পাটি বিছিয়ে। শোবার কিছুক্ষণ পর দ্রুত রাত গভীর হলো। মা কাঁদছিলেন। আমি কিছু বলতে পারছিলাম না। কিছু বলা উচিত কিনা বুঝতেও পারছিলাম না। মা বললেন, তুই ফিরে এলি কেন? গ্রামের লোকজন বলাবলি করছে, ডাকাত বাদল ফিরে এসেছে। মা'র থেকে জানলাম, গ্রামের এই প্রজন্ম আমাকে ডাকাত বলে জানে। সত্যি বলতে কি, ওদের ভুল জানানো হয়েছে। আমি ডাকাত ছিলাম না।

তুমি জাহানারার ছেলে বলে তোমাকে কথাগুলো বলছি। সত্যি বলতে কি কাউকে বলতে ইচ্ছে করছে। কি যেন তোমাদের কাগজের নাম? সে যাক, তোমার মা কেমন আছে? ভাল না থাকার কথা নয়। জেলে বসে শুনেছি, ওর ভাল জায়গায় বিয়ে হয়েছে। ভাল লেগেছে শুনে। আমি আর কি দিতে পারতাম বলো, একটা আক্রোশে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। তুমি যেটাকে মহান বলে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছো, তাকে মানুষ নষ্টতা বলছে, মা'র থেকে শুনলামইতো লোকজন আমাকে ডাকাত বলে জানে। আমি কিন্তু ডাকাতি করিনি কিংবা অমন ইচ্ছেও ছিল না। গতপরশু জেলার সাহেব ডেকে একটা চিঠি দিয়ে বললেন, ঈদ উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ইচ্ছেয় তোমার সাজা কমিয়ে তোমাকে মুক্ত করা হলো। তুমি ফিরে যাও। ভাল থেকো। একটা চিঠি হাতে ধরিয়ে দিয়ে উনি চোখ মুছলেন। ভদ্রলোক বেশ ভাল মানুষ। তার নাতিকে আমি পড়াতাম। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির অনুকম্পার চিঠিতেও উল্লেখ ছিলো, তিনটে ধর্ষণ আর দুটো হত্যা মামলা থেকে আমাকে মুক্ত করা হলো। সাজা ছিল ৩২ বছর। অনুকম্পা করে করে ২৫ বছরে মুক্তি দিয়েছে। মুক্তি পাওয়া কিংবা না পাওয়াতে আমার কোন বোধ ছিল না। জেলে মন্দ ছিলাম না। কৈ আমারতো কোন অবদমন নেই। আমি ভাল ছিলাম।

তোমার কাছে সিগ্রেট হবে? দাও দাও। জাহানারার ছেলে হয়েছো তো কি হয়েছে। তুমি চাইলে নিজেও একটা জ্বালাতে পারো। আমার সামনে টানতে আপত্তি করবার কোন কারন নাই। হ্যা, শুরু থেকেই বলি তাহলে। আর শোন, এ সব খবরের কাগজে লিখো না। এভাবে কোন বিপ্লব সফল হবে না। এটা ছিল আমার এক্সট্রা একটা আক্রোশ মাত্র। মানুষ, অন্তত সেই সময়ের মানুষ অত্যাচার সইতেই অভ্যস্ত ছিল। ওরা বিপ্লব কিংবা প্রতিবাদ কোনটাই চায়নি। চাইলে আজ আমাকে ডাকাত শুনতে হতো না।

আমি তখন মাট্রিক দেবো। বাবা চৌধুরী বাড়িতে কাজ করতেন। জমিজমা দেখাশোনার কাজ। জহুরুল চৌধুরী দশ গ্রামের মাথা। তার কথায় চলতো সবাই। গ্রামের সব সিদ্ধান্তের মালিক ছিলেন। বাবার কাজের সুবাদে আমি চৌধুরি বাড়ি যেতাম। চৌধুরীকে গ্রামের সবাই ভয় করে চলতো। ব্রিটিশ আমলের জমিদারের বংশধর জহুরুল চৌধুরি। তার চালচলনও ছিল ব্রিটিশ

আমলের অত্যাচারী জমিদারের মতোই। বাবার খোঁজে চৌধুরি বাড়ি গিয়ে একদিন ভর দুপুরে চৌধুরির ঘর থেকে একটা মেয়ের কান্না শুনতে পেলাম। গলা পরিচিত। ও বাড়ির কেউ নয়। আমি ওদের সবাইকে চিনতাম। কান্নার শব্দ আমার বেশ পরিচিত লাগলো। দড়জার ফাঁক দিয়ে দেখি আমার খুব পরিচিত পাড়ারই একজন মেয়েকে চৌধুরি জোর করে ধর্ষণ করছেন। নাম বলছি না, তুমি তাকে চিনতেও পারো। আমি কি করবো ভেবে পেলাম না। দৌঁড়ে বাইরে এলাম বাবাকে বলবো ভেবে। বাইরে বেড়িয়ে দেখি মেয়েটির বাবা দড়জার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আর বাবার কাছে গেলাম না। একটু দুর থেকে দেখলাম, ক্ষনিক পরে মেয়েটি ফিরে এলে তার বাবা তাকে নিয়ে বাড়ির দিকে গেলো। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম। ভাবলাম, আমাদের আড়ালে ও শরীর বিক্রি করা কোন মেয়ে হবে। কিন্তু না। কিছুদিন পর জানলাম, চৌধুরির জমি চাষ করে খাবার বিনিময়ে লোকটি তার মেয়েকে চৌধুরির কাছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম আমি। লক্ষ্য রাখছিলাম, চৌধুরি বাড়ির দিকে। সাত দিনেই অন্তত সাতটি মেয়ে কিংবা কারো বউকে চৌধুরির অপকর্মের শিকার হতে দেখেছি। আমি কিছু করতে পারিনি। বাবাকেও বলতে পারিনি। একদিন দেখলাম, কি এক কাজে ব্যর্থ হওয়ায় চৌধুরি বাবাকে পেটাচ্ছেন। আক্রোশে ফেটে পড়েছিলাম। কিন্তু চৌধুরির সামনে শক্তি নিয়ে দাঁড়াবার মতো আমার কোন অবলম্বন ছিল না। প্রতিশোধের ইচ্ছায় পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিলাম। কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

পরদিন দুপুরে জোড়া দীঘির পারে দুলালের সাথে দেখা। দুলাল চৌধুরির মেঝ ছেলে। আমার সাথেই পড়তো। অনেকটা বোকা টাইপের। আমি ওকে দীঘিতে গোসল করার জন্য নিয়ে পানিতে চেপে ধরেছিলাম। দুলাল বাঁচার জন্য ছটফট করছিল। ওর ছটফট দেখতে ঐ মেয়েটির কথা মনে পড়েছিল, যে মেয়েটি বাবার বয়সী চৌধুরির হাত থেকে বাচতে ছটফট করছিল। কিন্তু চৌধুরি কি অমানবিকভাবে মেয়েটির বারন উপভোগ করছিলো। দুলাল মারা গেল। সবাই ভাবলো দীঘিতে দোষ আছে। জীনপরী দুলালকে পানিতে চুবিয়ে মেরেছে। দুলালের মৃত্যুতে চৌধুরির কোন বোধদয় হয়নি। চৌধুরির অবস্থান আগের মতোই ছিল। দাও আরেকটা সিগ্রেট দাও। এক কাপ চা হলে ভাল হতো।

সেতুর কথা দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে পারি। সেতু চৌধুরীর দ্বিতীয় মেয়ে। আমার সাথেই পড়তো। দুলাল আর সেতু- দু'জনারই বেশ ভাব ছিল আমার সাথে। দুলালকে মারার পর আমার তেমন আপসোস হয়নি। প্রথম কয়েকটা দিন বিষন্ন ছিলাম। এটা তো কোন সমাধান নয়। বিপ্লব বলতে যা জানতাম তার কোন অংশও নয়। তাহলে কি করলাম আমি? যাক, যা হবার হয়ে গেছে। মাস খানেকের মধ্যে আবারো আক্রোশে জেগে উঠলাম। সেতুর সাথে আমার সম্পর্ক করতে সময় লাগেনি। একটা হৃদয়বৃত্তিক টান আগে থেকেই ছিল। তার সাথে যোগ করলাম আমার প্ল্যান। ব্যাস, আমি সফল মিশনের দিকে এগোলাম। এক দুপুরে স্কুল থেকে ফেরার পথে পাটক্ষেতে সেতুকে আমি ধর্ষণ করলাম। কি হে, তুমি কি লজ্জা পাচ্ছো শুনে? আমাদের সময়েও আমরা এসব আলোচনায় লজ্জা পেতাম না। এখন নাকি তোমাদের সময় অনেক এগিয়েছে। ভাবছো, আমি তোমার থেকে বয়সে অনেক বড়, তাই। তো কি হয়েছে,

শেয়ারিং কিংবা বন্ধুত্বে বয়স কোন ফ্যাক্টার নয়। তোমার মা আমার খুব ভাল বন্ধুও ছিল। তোমাকে হয়তো বলেনি কিছু। খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে ছিল জাহানারা। সেতু খুব আপত্তি করেছিল। বলেছিল, জোর করলে ওর বাবাকে বলে দেবে। আমি কোন ভয় পাইনি। গাঁয়ের মেয়েদের ওর বাবার নষ্ট করার ঘটনাগুলো আমার প্রবল আক্রোশ হয়ে সেতুর উপর নির্বান করেছিলাম। যেমনি নির্বান করেছিলাম দুলালের উপর। আমাদের তখন সতের বছর। সেতু কাউকে বলেনি। তবে আমার সঙ্গে আর সেভাবে মেশেনি। আমার তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। আমার প্ল্যান ছিল ওকে অন্তত একবার ধর্ষন করে ওর বাবার প্রতি প্রতিশোধ নেয়ার। আমি নিয়েছি।

সেতুর ছোট বোন যুথি। বারো কি তের হবে তখন। এখন তাহলে কত হয়েছে? তুমি কি জানো ওরা এখন কোথায় থাকে? চেষ্টা করো তো। একবার দেখবো ওদের। আমার পঁচিশ বছরের জেলজীবন স্বার্থক করা দরকার। আমার বিভৎস্য অবয়ব দেখে ওদের ভেতরে আবারো নতুন করে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে তার বিনিময় পঁচিশ বছরের জেলজীবন। আমি কোনভাবেই আর আশা কিংবা হতাশাবাদী নই। যুথিকে ধর্ষণ করতে আমার অনেক সময় কাটাতে হয়েছে। শুধু যুথিকে ধর্ষণ করাই শেষ উদ্দেশ্য হলে অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। আমার আরো কাজ বাকি ছিল। ভয় ছিল যুথি তো সেতুর মতো নয়, যদি চৌধূরীকে বলে দেয় তাহলে আমার সব প্ল্যান শেষ। যাক, কোন অদৃশ্য আর্শিবাদ আমাকে মুক্ত করতে পেরেছিল সব সঙ্কা থেকে। বলতে হয়, লাভবানই হয়েছিলাম। একদিন যুথিকে ছেড়ে বেড়িয়েছি এমন সময় সেতু সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো, তোমার সব বুঝে গেছি। আমার সাথে যা করেছো, প্লিজ ছোট বোনটাকে এভাবে বিপদের সামনে দাঁড় করিয়ো না। আমি সেদিন হেসেছিলাম। শুধু কষ্ট ছিল, সেতুকে বলতে পারিনি, সেতু, আমি চরিত্রহীন নই। আমি কোন অন্যায় করছি না। তোমার বাবার প্রতি প্রতিশোধ নিতে তোমার প্রতি আমার যে টুকু নষ্টামি। নষ্টামি তোমার বোনের প্রতি। পরের দিন যখন সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছিলাম, আমি আর এ পথে এগুবো কি না। ঠিক তখন পেয়ে গেলাম আরেকটি সুযোগ। সবে রাত শুরু হয়েছে। কৃষ্ণকাল। চৌধুরীর বাবা কোথাও থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। আশেপাশে কোন সাড়াশব্দ নেই। অনেকক্ষণ তার পিছুপিছু হেটে শ্যামলীর মোড়ে তার কাছাকাছি চলে এলাম। উনি আমাকে দেখে ধমকে উঠলেন। কেন ধমকে উঠেছিলেন আজ এতোদিন পর মনে নেই। আমি প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি। অন্য দিকে চলে গেলাম। শেখর চৌধুরী আবারো হাটতে থাকলেন। খুব সঙ্গোপনে পিছু এসে তার মাথায় একটা কাঠের গুড়ি দিয়ে আঘাত করলাম। খুব কম সময়ের জন্য বিকট একটা শব্দ করে শেখর চৌধুরী মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি আর দেরি করিনি। অন্য কোন লোক আসার আগেই বাড়ি এসে ঘুমিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমি সেই দিনগুলোতে ঘুমোতে পারতাম না। আমি কি করছি, এমন একটা অস্থির চিন্তাধারা আমাকে পাগল করে রাখতো। সত্যি বলতে কি, আমি এখনো ঘুমোতে পারি না। স্মৃতি এবং বিস্মৃতি এখনো আমাকে পোড়ায়। সেই সময়টা আশেপাশের দশগ্রামে তোলপার করা ঘটনা ছিল চৌধুরী পরিবারের ঘটনাগুলো। চৌধুরীর ছেলে খুন হবার কয়েকদিন পর বাবা খুন। মানুষ সারাদিন আলোচনা করতো এই বিষয়গুলো।

তখনো কেউ সরাসরি বলতে পারতো না, যে সে খুশি হয়েছে। কিন্তু বোঝা যেত, প্রতিশোধ পরায়ন মানুষগুলো বেশ খুশি হয়েছিল। পুলিশ প্রশাসনের চোখে ঘুম ছিল না। কারা এই সব ঘটনা ঘটাতে পারে, সেই তথ্য বের করার জন্য পুলিশ অসংখ্য মানুষকে আটক করেছিল। জেরার নামে পিটিয়ে আক্রোশ মিটিয়েছে। এ তালিকা থেকে বাদ যায়নি আমার বাবাও। চৌধুরী বাড়ির কর্মচারী হিসেবে পুলিশ বাবাকে গাঢ় ভাবে সন্দেহ করেছিল। তাই বাবাকে সহ্য করতে হয়েছিল অকথ্যসব অত্যাচার। জেলে একবার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বাবার চোখের জলে যে ছবি দেখেছি তাতে স্পষ্ট লেখা ছিল, চৌধুরীর সব অত্যাচারের সালতামামী। বাবা কোন কথা বলেনি। সে বলেওনি সে নির্দোষ। শুধু বলেছিল, তোর সামনে অনেক পথ। দেখেশুনে চলিস। বাবা বোধহয় ধরেই নিয়েছিল সে আর বেরুতে পারবে না। কিন্তু কেবল আমি জানতাম, শিঘ্রয় বাবা জেল থেকে বেরুবে। জেলে থাকবো আমি। যেদিন সবার সামনে চৌধুরীকে খুন করবো, ঠিক সেদিন আমি হাসতে হাসতে ঢুকবো জেলে, বাবা বিষন্ন মুখে বেড়িয়ে আসবে জেল থেকে। তারপর আশ্চর্য হয়ে একদিন চৌদ্দ শিকের মধ্যে দিয়ে তাকাবে আমার দিকে। আমিও বাবাকে কোন কথা বলবো না। বলবো না, বাবা আমি দোষী কি নির্দোষ। আমি কেন খুন করেছি। কেন ধর্ষণ করেছি।

পরীক্ষা হয়ে গেল। মাট্রিক। গ্রাম থেকে আমরা দু'জন পরীক্ষর্থী। আমি আর জাহানারা। কোন মতে পারীক্ষা শেষ করেছি। একের পর এক খুন ধর্ষণ করে পরীক্ষার হলে লিখা খুব সহজ কথা নয়। তোমর কি যেন নাম, ভুলে যাই সবকিছু। যাক, পরীক্ষা শেষ করে একদিন বাবার জামিনের কথা বললার ছল করে চৌধুরী বাড়ি গেলাম। মতলব ছিল চৌধুরীকে খুন করবার স্পট প্ল্যান তৈরী। হলো না। খুব ভয়ে ভয়ে চৌধুরী বাড়িতে ঢুকলাম। দোতালায় উঠলাম। কাউকে চোখে পড়লো না। উত্তরের ঘরে গিয়ে দেখি সম্পা আপা ঘুমোচ্ছেন। সম্পা চৌধুরীর বড় মেয়ে। আমার চেয়ে অন্তত আট বছরের বড় হবেন। আমার জিদ চাপলো। দড়জা আটকিয়ে উন্মাদের মত ঝাঁপিয়ে পড়লাম সম্পা আপার উপর। গায়ে গতরে প্রবল শক্তি ছিল তখন। গ্রামের কেউ মারামারিতে আমার সাথে লাগতে চাইতো না। আমি ধর্ষণ করলাম। সম্পা আপার চিৎকারে দড়জায় এসে দাঁড়িয়েছে অনেক লোক। দড়জা ভাংগার চেষ্টার শব্দ শুনলাম। আমি আমার আক্রোশ শেষ করে দড়জা খুললাম।

জেলে এক সপ্তাহের মত প্রচন্ড পিটিয়েছে আমাকে। আমি অকপটে সব স্বীকার করেছি। কেন এই সব করেছি তার ব্যাখ্যা দিয়েছি। কোন কথায় শোনেনি। ইচ্ছে মত পিটিয়েছে। ওদের ধারণা কিংবা ইচ্ছে আমাকে ডাকাত হিসেবে প্রমান করা। শেষ পর্যন্ত আমি আমাতে অটল থাকতে পেরেছিলাম।

সেদিন চূড়ান্ত রায় হবে। গ্রামসুদ্ধ লোক এসেছে আদালতে। সবার মুখ বিষন্ন। আমি এজলাসে দাঁড়ালাম। জজ সাহেবের এক প্রশ্নের উত্তরে বললাম কেন সম্পাকে ধর্ষণ করেছি। যে অবশিষ্ঠ কথা পুলিশ- আদালত- বাবা কিংবা গ্রামের লোক জানে না, সেই কথাগুলোও বলে দিলাম অকপটে। আমি খুব নির্ভিকচিত্তে বলে দিলাম, শুধু সম্পাকে নয়, আমি খুব সুস্থ্য মাথায় ধর্ষণ করেছি চৌধুরীর তিন মেয়েকেই। সেতু আর যুথির কাছে আমি নিকৃষ্টতম মানুষ হয়তো

*হয়েছিলাম। কিন্তু বলে দিয়েছিলাম, শুধু সেতু, যুথি, সম্পাকে ধর্ষণ নয়, আমি ঠান্ডা মাথায় খুন করেছি চৌধুরীর ছেলে দুলাল আর চৌধুরীর বাবা শেখর চৌধুরীকেও। সেদিন গোটা গ্রাম স্তব্ধ হয়ে শুনছিল আমার কথা। অবাক হয়ে শুনছিলেন জজ সাহেব। তার জীবনে এমন সরল স্বীকারোক্তি দেয়া কোন কয়েদিকে তিনি দেখেননি বলে মন্তব্য করেছিলেন। রায় ঘোষণার পালা। আমি স্বাভাবিক। জানি আর ফাঁসি থেকে কোনভাবে বেরোতে পারবো না। তাতে কোন আফসোসও নেই। কিন্তু না আমার ফাঁসির আদেশ হলো না। রায় ঘোষণার আগে আমার পক্ষ থেকে আমার উকিল জজ সাহেবের কাছে আর্জি করে জানিয়েছিলেন, হুজুর, ওর বয়স কম। গতকাল মাট্রিকের রেজাল্ট বেড়িয়েছে। জেলার মধ্যে ও এক নাম্বার স্থান অর্জন করেছে। ওর প্রতি একটুকু দয়া করবেন। জজ সাহেব আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। চারদিক স্তব্ধ। লাগাতার এক মিনিট তাকালেন আমার দিকে। বসলেন। মাথা নিচু করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে লিখলেন। মাথা নিচু করে পড়ে শোনালেন। দুইটা খুন আর তিনটা ধর্ষণের স্বঘোষিত আসামী বাদলের যাবৎজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডের বাংলা বিধান।*

*অংশু মোস্তাফিজ*
*রোমেনা আফাজ সড়ক,*
*জলেশ্বরীতলা, বগুড়া, বাংলাদেশ।*
*ইমেইলঃ* aungso1987@gmail.com